উপন্যাস

# বেশি দূরে নয়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

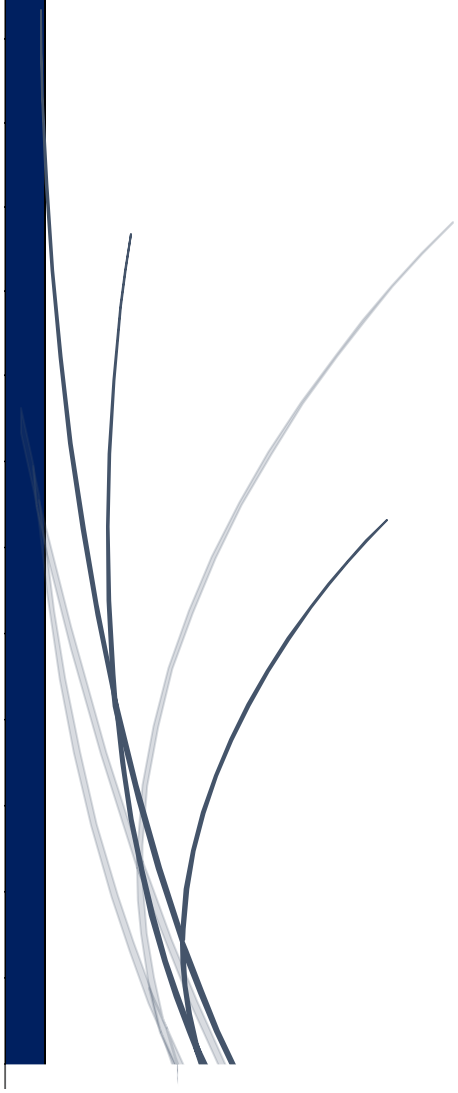

BENGALIEBOOK.COM
2021

# সূচিপত্র

বেশি দূরে নয় - ০১ ..... 2
বেশি দূরে নয় - ০২ ..... 7
বেশি দূরে নয় - ০৩ ..... 9
বেশি দূরে নয় - ০৪ ..... 15
বেশি দূরে নয় - ০৫ ..... 18
বেশি দূরে নয় - ০৬ ..... 23
বেশি দূরে নয় - ০৭ ..... 28
বেশি দূরে নয় - ০৮ ..... 31
বেশি দূরে নয় - ০৯ ..... 36
বেশি দূরে নয় - ১০ ..... 40

# বেশি দূরে নয় – ০১

খানিকটা দৌড়তে হল শেষ দিকে। নইলে, মেচেদা লোকালটা ধরা যেত না। কিন্তু ট্রেনে উঠেই বুকটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মণিরামের। বাঁ বুকটা চেপে ধরে মণিরাম কঁকিয়ে উঠল– গেছে রে প্রীতম!

প্রীতম গায়ে- পায়ে মানুষ। অত বড় দুটো ভারী ব্যাগ দু'হাতে নিয়ে মণিরামকে সাত হাত পিছনে ফেলে শেষের দু'নম্বর বগিতে উঠে পড়েছে। মেচেদা লোকালে তেমন ভিড় নেই। সিটে বসে প্রীতম পাশে জায়গা রেখেছে তবু। বলল– কী গেল?

–মানিব্যাগটা। তেইশ বছরে এই প্রথম পকেটমারি! বুঝলি?

–বউনি হল তা হলে! তা গেল কত?

–টাকাটাই কি বড় কথা রে? গুমোর ভেঙে দিল যে।

–টাকাটা কি ফ্যালনা নাকি?

–তা ধর, সুখরামের গদিতে দেড় হাজার ঝেড়ে এলাম। কেশববাবুর তিনশো চল্লিশ। আগাম দিতে হল ধানুরামকে। নেই নেই করেও একুশ টাকা ছিল।

–তাই বল। চোরেরও কি মুখরক্ষা হল? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

মণিরাম ধপ করে বসে পড়ল পাশে। বুকপকেটের কাছটা এখনও ডান হাতে চেপে ধরে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না যেন।

–কখন নিল বলতে পারিস? ভোজবাজির মতো উবে গেল যে!

–ও সব না শিখে কি আর লাইনে নেমেছে গো! টেরই যদি পাবে, তা হলে সে আর পকেটমার কীসের? তবে আহাম্মক বটে। ফিরতি পথে মাল গস্ত করে করেও পকেটে পয়সা থাকে?

গাড়ি ছেড়েছে। কার্তিকের শেষ, এখন চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় গা শিরশির করে। আজ একটু মেঘলাও আছে বলে হাওয়াটা ঠাণ্ডা।

–জানালাটা নামিয়ে দিবি নাকি?

—আমার মাল টেনে ঘাম হচ্ছে। একটু শুকোতে দাও, তার পর নামিয়ে দেবখ' ন।

—একুশটা টাকাই তো নয়, মেলা কুচো কাগজ ছিল। বগলামায়ের একখানা ছবি, পাঁচ-ছ'টা ঠিকানা, গোটা কয়েক ফোন নম্বর। বড় গুমোর ছিল। কোনও দিন পকেটমারি হয়নি আমার। প্রায় নিত্যি যাতায়াত এই তেইশ বছরে।

—ও সব ভেবে খামোখা হা- হুতাশ করো কেন? টাকাই যখন তেমন যায়নি তখন দুঃখ কীসের? অল্পের ওপর দিয়ে বউনিটা হয়ে গেল। বরাবর তোমার বরাতের জোর তো দেখছি!

—তোর নজরে নজরেই আমার এ সব হয়েছে। বরাতের দেখলিটা কী রে শালা! মরছি নিজের জ্বালায়। বাজারে দেনা কত জানিস? প্রীতম জানালাটা নামিয়ে দিয়ে বলল, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো তো! দেনার কথা কাকে বলছ? মায়ের কাছে মাসির গপ্পো? দেনায় তোমার হাঁটুজল হলে আমার ডুবজল। বছর ঘুরতে কারবারটা যদি না দাঁড়ায়, তা হলে হাজতবাস কপালে আছে।

মণিরাম প্রীতমের অবস্থাটা জানে। রা কাড়ল না। ছোঁড়া পরিবার নিয়ে হয়রান হয়ে গেল। বাপ বিনোদকুমার একটা জীবন জুয়ো খেলে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করে এখন জবুথবু হয়ে বসে বসে বিড়বিড় করে।

মণিরামের বউ দীপির আবার প্রীতমকে ভারী পছন্দ। ননদ ফুলির জন্য দেগে রেখেছে। ফুলির ভাবগতিক অবশ্য বোঝা যায় না। লেখাপড়া নিয়ে ভারী ব্যস্ত। বিয়ের কথা বলতে গেলেই ঝেঁঝে ওঠে।

প্রীতম তার ভগ্নিপোত হলে মণিরামের ব্যাপারটা অপছন্দের হবে না। ছোকরা লড়িয়ে আছে বটে। বাপের এক পয়সার মুরোদ ছিল না। চারটে ভাইবোন যে কী কষ্ট করে বড় হয়েছে তা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। শাকের ঝোল আর ভাত। কিংবা কখনও শুধু শাকের ঝোল, কখনও মেটে আলু, কচু- ঘেঁচু খেয়ে বড় হয়েছে। বাড়ি- জমি সব বেহাত হয়েছে। দেনায় বিনোদকুমার ভুরু অবধি ডুবে ছিল। প্রীতম মাধ্যমিকটা ডিঙিয়েই কাজে নেমে পড়ল। মণিরাম নিজে ব্যবসাদার বলে জানে, হ্যাপা কত। আর কত লোকের বায়নাক্কা বুঝে চলতে হয়। প্রীতম শুরু করেছিল চাল বেচে। এখন গঙ্গারামপুরে দু'দুখানা দোকান।

ধারকর্জ আছে বটে, কিন্তু বুকের পাটা আর রোখ আছে বলে সব কাটিয়ে ভেসে উঠবে ঠিক।

মানিব্যাগটার কথা খানিক ভুল পড়ল লেবু-চা খেয়ে। প্রীতমই খাওয়াল। বলল, মুখটা অমন আঁশটে করে রেখো না তো। পিছনের দিকে যত চাইবে তত এগোতে ঢিলে পড়বে।

—ওরে, পকেটমারিটা বড় কথা নয়, আহাম্মকির কথাটাই ভাবছি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি হুঁশিয়ার মানুষ। ট্রেনটা ধরতে দৌড়তে না হলে

—এ বার থেকে গোঁজ করে নাও। অবিশ্যি যখন যাওয়ার তখন গোঁজও যাবে।

চেনা- জানা দু'চার জন উঠে পড়ল কামরায়। রাধাপুরের সুধীর হাজরা, বীরশিবপুরের কানাই মণ্ডল, আরও দু'তিন জন এ দিক- ও দিককার চেনা লোক। সুধীর পাশের ফাঁকা সিটে বসে বিড়ি ধরিয়ে তার শালার বিয়ের গল্প ফেঁদে বসল। কথায় কথায় পথটা কেটেও গেল, যেমন রোজই যায়।

উলুবেড়েতে নেমে কুতুবের দোকান থেকে দু'জনে জমা রাখা সাইকেল বের করল। ক্যারিয়ারে একখানা ব্যাগ নাইলনের দড়িতে বেঁধে, আর একখানা ব্যাগ হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে প্রীতম বলল, তুমি এগিয়ে পড়ো মণিরামদা। আমাকে সাইকেল ঠেলেই যেতে হবে। এ গন্ধমাদন নিয়ে তো সাইকেলে চাপার উপায় নেই।

—চাপবখ'ন। একটু হাঁটি চল তোর সঙ্গে। একখানা ব্যাগ আমার সাইকেলে চাপিয়ে দে না।

—না গো মণিরামদা। তুমি হলে আয়েসি মানুষ। জীবনে মালপত্র বয়েছ কখনও?

—ছেলেবেলায় বয়েছি। তখন তো বাবার এত ফাঁদালো কারবার ছিল না। তখন বাপ-ব্যাটায় বিস্তর বয়েছি।

—তোমার হল আদরের শরীর। গদিতে পয়সা ফেলে চলে এলে। তারা মালপত্র ট্রাকে পাঠিয়ে দেবে। আমার তো তা নয়।

গঙ্গারামপুর অনেকটা রাস্তা। হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবতেই মণিরামের গায়ে জ্বর আসে। কথাটা ঠিক, তার বেশি কষ্ট করার স্বভাব নয়। বাপের বড় কারবার থাকলে এইটে সুবিধে।

প্রীতম আগে আগে, কয়েক পা পিছিয়ে মণিরাম। ও দু'খানা ব্যাগের ওজন মণিরাম জানে। সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। মণিরাম পেরে উঠত না। একটু ঝুঁকে ওই গন্ধমাদন ঠেলাওলার মতো নিয়ে চলেছে প্রীতম। একটা ভ্যান ভাড়া করতে পারত। কিন্তু ও তা করবে না। বরাবর নিজের মাল নিজেই বয়ে আসছে। পিছন থেকে দৃশ্যটা দেখে হিংসে হয় মণিরামের। কী পুরুষালি, শক্ত সমর্থ শরীর প্রীতমের! তার নিজের বড় বাবু শরীর। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তার একটু চর্বি জমেছে শরীরে, দৌড়ঝাঁপেও কমছে না। দীপি আজকাল বলে, কেমন ন্যাদস মার্কা হয়ে যাচ্ছ, কেন গো?

—তুমি সাইকেলে চেপে এগিয়ে পড়ো মণিরামদা। আমার সঙ্গে ভদ্রতা কীসের?

—একা একা এতটা পথ যাবি?

—দোকা পাব কোথায়? নিত্যিদিন যাচ্ছি। রোজ তো আর তুমি থাকো না।

—তা বটে। ফেরার সময় আজ আবার বিপিন ডাক্তারের বাড়ি হয়ে যেতে হবে। তোর বউদির ব্যথাটা কমছে না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ যাও।

—দেখে বুঝে যাস। সন্ধের পর দেখা হবেখ'ন।

মণিরাম সাইকেলে চেপে বসল।

বয়সে পাঁচ- সাত বছরের বড় এই মণিরামদাদাকে প্রীতম পছন্দই করে। বহু বার মণিরাম তাকে ব্যবসার জন্য টাকা হাওলাত দিতে চেয়েছে। অভাবের দিনে সাহায্য করতে চেয়েছে। প্রীতম নেয়নি। নেওয়া জিনিসটার একটা অসুবিধে হল, লোকটার মুখোমুখি হলেই কেমন যেন অসোয়াস্তি হতে থাকে, যেন সমান সমান মনে হয় না। দুর্বল আর ছোট লাগে নিজেকে। তবে হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের লোনটা পাইয়ে দিতে মণিরামদা জামিন না হলে মুশকিল ছিল। সেই লোন প্রাণপাত করে শুধতে হচ্ছে। আধাআধি হয়ে এসেছে এখন। বিকিকিনি একটু একটু করে বাড়ছে। রাতারাতি, শর্টকাটে যে কিছু হওয়ার নয়, তা প্রীতম ভালই জানে। শর্টকাটে বড়লোক হতে গিয়েই না তার বাপটা ডুবে গেল।

না, বাপের ওপর রাগ নেই তার। সব লোক কি সমান হয়? অপদার্থ হোক, জুয়াড়ি হোক, এই বাপটা তো তাকে বরাবর বুক দিয়ে ভালবেসেও এসেছে। ভাতে টান পড়লে 'বাইরে

খেয়ে এসেছি' বলে ছেলেমেয়েদের মুখে গ্রাস তুলে দিত। মা যদিও দু'বেলা ঘর- বসা লোকটাকে উঠতে- বসতে উত্তম- কুত্তম অপমান করে, কিন্তু প্রীতমের বড্ড মায়া হয়। বাপটা খারাপ ছিল না তার, তবে বড্ড বোকা আর অদূরদর্শী। এখন মনস্তাপে কষ্ট পায়। মাঝে মাঝে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। বাপকে দেখে দেখে ছেলেবেলা থেকেই তার রোখ চেপেছিল, কিছুতেই বাপের মতো হবে না সে। সংসারকে বাঁচাতে হবে। মাধ্যমিকটা পাস করার পরই সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে উঠল। তখন ওই মণিরামদাদা পাশে না থাকলে গাড্ডায় পড়ে যেত সে। তেজেনবাবু চানাচুরের কারখানা খুলেছিলেন। প্রথমে সেটাই বাকিতে নিয়ে দোকানে দোকানে দিত সে। বিক্রি ভাল ছিল না। তার পরে বেকারির বিস্কুট সাপ্লাই দিতে লাগল। সেটাও ফেল মারল। কাঁচা সবজিও চলল না তেমন। বাজারের একটেরে গলির মধ্যে হীরু দাসের মনোহারী দোকান ছিল। সেটা মোটেই চলত না। হীরু দাস মারা যাওয়ার পর তার ছেলে সুধীর দোকানটা বেচে দিল। কিনল মণিরামদাদার বাবা সফলরাম। কিন্তু তার গোটা পাঁচেক দোকান, তার ওপর হোলসেল। হীরু দাসের দোকানটা কিনেও ফেলেই রাখতে হচ্ছিল। মণিরামদাদা তখন তার বাপকে বলে দোকানটা বন্দোবস্ত দিল প্রীতমকে। সফলরাম ছেলের মতো নয়। মায়াদয়া দেখানোর লোক নয়। পরিষ্কার বলে দিল,

—দানখয়রাত করতে পারব না বাপু, তবে তোর কাছ থেকে লাভও তেমন নিচ্ছি না। পাঁচ পারসেন্টে ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তিন মাসের মধ্যে ডাউন পেমেন্ট।

ব্যাঙ্কের টাকাটা পেয়ে ধার শোধ করে দোকানটা নিয়ে ফেলেছিল সে। গলির দোকান চলে না হয়তো। কিন্তু, দোকানি যদি ভাল হয় তবে তেপান্তরে দোকান দিলেও খদ্দের খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হয়। প্রীতম দাঁতে দাঁত চেপে তার গরিব দোকানটার পিছনে পড়ে রইল। বাছাই জিনিস, কম লাভ আর মিষ্টি কথা। এই সবই ছিল তার মূলধন। লোককে ঠকায় না, নিজেও না ঠকবার চেষ্টা করে।

# বেশি দূরে নয় – ০২

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের দু' ধারে দুটো আর ক্যারিয়ারে আরও একটা পেল্লায় সাইজের ঠাস- ভর্তি নাইলনের ভারী ব্যাগ চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যে লোকটা সে হল গঙ্গারামপুর বাজারের ছোট দোকানদার প্রীতম। সপ্তাহে দু'দিন বিকেল চারটে ছত্রিশের লোকালে এসে নামে। কুতুবের দোকানের পিছনে সাইকেলের খোঁয়াড় থেকে নিজের দীনদরিদ্র সাইকেলখানায় মালপত্র চাপিয়ে সেই গন্ধমাদন ঠেলতে ঠেলতে গঙ্গারামপুর পর্য্যন্ত যায়। কোনও দিকে তাকায় না। অত বোঝা টানলে কি আর মানুষ মানুষের মতো থাকে? হালের বলদের মতো হয়ে যায়। কিন্তু তাকালে, এই কার্তিকের বিকেলের মায়াময় আলোয় শিকদারবাড়ির বারান্দায় শেফালিকে ঠিক দেখতে পেত। প্রীতম শেফালিকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু শেফালি প্রীতমকে দেখতে পায় এবং দেখে। বলতে নেই, শত কাজ থাকলেও সপ্তাহে দু'দিন ঠিক সাড়ে চারটের লোকাল আসার সময়টায় শেফালি বারান্দায় এসে দাঁড়াবেই।

না, প্রীতম ঠিক মানুষ নয়, খানিকটা মানুষ, বাকিটা এক বলশালী, গোঁয়ার অবুঝ জন্তু। টালমাটাল সাইকেলখানাকে ওই ভারী মাল সমেত সামলানোর জন্য গায়ের জোর লাগে। প্রীতমের সেটা আছে। কিন্তু শুধু গায়ের জোর থাকলেই তো হবে না গো! তোমার আর কিছু নেই? চোখ নেই তোমার? দেখতে পাও না, তোমার জন্যই একটা তাজা বয়সের মেয়ে কেমন লাতন হয়ে, বিভোর হয়ে চোখ বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে? তাও তো রোজ তোমার দেখা নেই। সপ্তাহে মোটে দুটো দিন।

যত দূর দেখা গেল চেয়ে রইল শেফালি। কী চওড়া পিঠ, দু'খানা শাবলের মতো হাত, একটু কুঁজো হয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে। যেন এ ছাড়া ওর আর কোনও কাজ নেই দুনিয়ায়।

প্রীতম চলে গেলে শেফালির বিকেল ফুরিয়ে যায়। অনেক ক্ষণ আর কিছুই থাকে না। সব 'না' হয়ে যায়। সে যে খুব সুন্দরী মেয়ে তা নয়, আবার কুচ্ছিতও নয়। তাকে দেখে কেউ

কখনও বলেনি, 'বাঃ, কী সুন্দর মুখখানা', বা বলেনি, 'ইস কী কুচ্ছিত রে'! বড্ড মাঝারি মেয়ে সে। নিজেকে আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে সে। কখনও পছন্দ হয়, কখনও হয় না। কিন্তু চেহারা ছাড়া কি মেয়েদের আর কিছু নেই? শুধু দেখনসই হলেই হল?

'পিউ স্টোর্স'- এ সে এক আধবার গেছে। প্রীতমের দোকান। চোখ তুলে দোকানির দিকে চাইতে সাহস হয়নি। পেনসিল, মাথার তেল বা ওই রকম কিছু কিনে কাঁপা হাতে দাম দিয়ে মুখ নিচু করে চলে এসেছে। তার বেশি এগোতে পারেনি কখনও। ও সব জিনিস পাড়ার দোকানেই পাওয়া যায়। তবু যে এত দূর কষ্ট করে যায় সে তা কি কেউ টের পায়, বোঝে?

আজও একটু সেজেই দাঁড়িয়ে ছিল শেফালি। কোনও কাজে লাগল না। মধুমিতাকে সে সব বলে। তার গলাগলি বন্ধু। মধুমিতা বলে, দাঁড়া না, ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে। তবে প্রীতমদারা কিন্তু বড্ড গরিব। এখন অবশ্য ততটা গরিব আর নেই।

—গরিব তো কী? গরিবরাই ভাল।

# বেশি দূরে নয় – ০৩

শেফালির হাবা ভাই সীতু ওই বসে আছে দাদুর কাছে। পুজোর ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে দাদু বসে আছে একটা হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে। সীতু হাফ প্যান্টের নীচে তার দুটো আদুর রোগা ঠ্যাং ঝুলিয়ে। পায়ের কাছে টাইগার কুকুর। এই ষোলো বছর বয়সেও বুদ্ধি খুলল না সীতুর। সারাক্ষণ কেবল বড় বড় দাঁত বের করে হাসে। একটা পচা স্কুলে সেই কবে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছিল, আজও সেই থ্রিতেই পড়ছে। সীতু কোনও দিন ফোরে উঠবে না, সবাই জানে। তবু মাসে মাসে বাবা ওর স্কুলের বেতন মিটিয়ে দেয়। তাই স্কুল থেকে ওকে তাড়ায় না। ওর যত ভাব দাদু আর টাইগারের সঙ্গে। এ বাড়িতে একমাত্র দাদুই যা ওকে কাছে ডেকে বসায়, কথাটথা কয়। আর টাইগার সারা দিন সীতুর পিছনে পিছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। বোকা বলে সীতুর তেমন বন্ধু নেই। খেলায়ও নেয় না কেউ ওকে। ও যে বোকা তা টাইগার বুঝতে পারে না, তাই ও টাইগারের সঙ্গেই ছোটাছুটি করে খেলে।

আর তার দাদু খুব একাবোকা মানুষ। যেন একটা ফেলে দেওয়া ন্যাকড়ার মতো এক ধারে পড়ে থাকে। ঠাকুরঘরের পিছন দিকটায় একটা খুপরি মতো আছে। ভারী ছোট্টো ঘর। একটা চৌকি এঁটে আর এক চিলতে জায়গা। তেল, মাজন সব জানালার তাকে। ব্যস ওতেই দাদুর হয়ে যায়। ঠাকুমা মারা গিয়ে অবধি দাদু পিছু হটতে হটতে ওইখানে গিয়ে ঠেকেছে। তাকে কারও মনেই পড়ে না। শেফালির পড়ে। দিনে এক বার দু'বার সে গিয়ে দাদুকে দেখে আসে। কথা কয়। তবে শেফালিরও তো কাজ আছে। ক্লাসের পড়া, মায়ের ফরমাস, একটু আড্ডা, একটু মন-খারাপ করে বসে থাকা। এই মন-খারাপটা বড্ড ভাল জিনিস। রাজ্যের অভিমান উঠে আসে বুকে। নাক ফুলে ফুলে ওঠে। কান্না পায়। কার ওপর অভিমান তা বুঝতে পারে না। গোটা দুনিয়াটার ওপর, এই মানবী জন্মের ওপর, প্রীতমের ওপর। সব কিছুর ওপর অভিমান উথলে ওঠে যখন, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে যে কী ভালই লাগে।

মেয়ে-জন্মের একটা বাধক হল, বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই কেউ না কেউ চোখ পাকিয়ে বলবে, অ্যাই কোথায় যাচ্ছিস? যেন নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যাওয়ার নেই তার। এই যে কার্তিকের এই মায়াবী বিকেলে পশ্চিমের খুনখারাপি আকাশের তলায় এক মায়াজাল পাতা হয়েছে, এ কি তার জন্যই নয়?

জন্ম থেকেই দেখে আসছে শেফালি, তাদের এই জায়গাটা ভারী দুঃখী জায়গা। জায়গাটার যেন সব সময়ে মুখভার। কখনও হাসি ফোটে না মুখে। ক'দিন আগে রানাঘাটে মাসির বাড়িতে গিয়েছিল শেফালি। কী হাসাখুশি জায়গাটা। সব সময়ে যেন আহ্লাদে গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে সাহস করে বোম্বে রোডের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে যখন যায় শেফালি, তখন মনে হয়, জায়গাটা যেন এক দুষ্টু-দুষ্টু পুরুষ মানুষ। লরির সার দাঁড়িয়ে আছে। ধাবায় কেমন ব্যস্তসমস্ত লোকজন। কেমন সাঁ করে অনেক দূর চলে যাচ্ছে চকচকে সব গাড়ি। বাবা যে কেন বাড়িটা ও দিকে করল না কে জানে। স্টেশনের এ-পাশটা বড্ড পান্তাভাত, ঝিমধরা।

—মা একটু আসছি।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—মণিমালাদের বাড়িতে।

—দয়া করে তাড়াতাড়ি এসো।

সবাই জানে, সে খুব বেশি দূর যাবে না। তারা, মেয়েরা সব অদৃশ্য দড়িতে শক্ত করে বাঁধা। তাদের কোনও দূর নেই। কোনও অনন্ত নেই। এক বাঁধা অবস্থা থেকে আর এক বাঁধা পড়ার জন্যই তারা জন্মায়।

কী হল হেনার? তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট মাঠটায় এক শীতকালে বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছিল বিনোদ মাল। বাঁশের খুঁটিতে লাইট লাগানো, চব্বিশ ঘণ্টা মাইকে হিন্দি গান, চার দিকে ভিড়ের মধ্যে ঝালমুড়ি, ফুচকা, চানাচুর-বাদামের দোকান বসে গেল। বিনোদ সাইকেল চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। শেফালিও বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে যেত। কিন্তু মজা লাগত না তার। কষ্ট হত রোগাপানা ছেলেটার জন্য। কী কষ্ট ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল করে যাওয়ার মধ্যে! বিনোদের ওই কষ্ট আর

পুরুষকার জানালার ফাঁক দিয়ে দিনরাত দেখত হেনা। তারও কষ্ট হত। আর হতে হতেই তার বুক উথলে উঠল। প্রাণ আকুল হল। হাউ হাউ করে কাঁদত। যে দিন বাহাত্তর ঘণ্টা শেষ হল সে দিন বিনোদকে কাঁধে নিয়ে পাড়া ঘোরাল ক্লাবের ছেলেরা। টাকার মালা পরানো হল। বিনোদের জয়ধ্বনিতে কান পাতা দায়। হেনা গিয়ে ছলছলে চোখে তার গলার সোনার চেনটা খুলে পরিয়ে দিয়েছিল বিনোদকে। প্রকাশ্যেই। তাতে একটা কানাকানি শুরু হয়েছিল। আর বাবার হাতে বিশ বছরের মেয়েটা খেয়েছিল বেদম মার। শেষে ওই বিনোদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল হেনা। গিয়ে দেখল বিনোদের আরও একটা বউ আছে, দুটো বাচ্চা এবং হাঁড়ির হাল! বিনোদের সংসারের জন্য সময় নেই। সে কেবল এখানে-সেখানে সাইকেল চালিয়ে বেড়ায়। ওটাই তার রুজি-রোজগার। শখ আহ্লাদ দু'দিনেই মরে গিয়েছিল হেনার। এই বছরখানেক আগে কোলে একটা খোকা নিয়ে বাপের বাড়িতে ফেরত এসেছে।

মেয়েদের জীবনটাই ও-রকম। যতই ভালবাসুক না কেন, পুরুষ জাতটাই তো বিশ্বাসঘাতকের জাত। হেনা আজকাল দুঃখ করে বলে, কী বয়স আমার বল! লেখাপড়া করতে পারতাম, গান গাইতে পারতাম। জীবনটাই মাটি হয়ে গেল। কেন যে পোড়া চোখে ওই সাইকেল চালানো দেখতে গিয়েছিলাম।

মেয়েদের জীবনটা এ-রকম। তা বোঝে শেফালি। সব বুঝেও ফের ফাঁদে পা দিতেও ইচ্ছে হয়। যত বার ঠকে যাক, ফের ঠকতে রাজি হয়ে যাবে হাসি-হাসি মুখ করে। তারা বড্ড বোকা। তার হাঁদা ভাই সীতুর সঙ্গে সত্যিই কি তার কোনও তফাত আছে? কথাটা ভাবতে ভাবতেই সীতুর ডাক কানে এল, দিদি! এই দিদি! ফিরে দাঁড়িয়ে শেফালি বিরক্ত গলায় বলল, কী হল?

—কোথায় যাচ্ছিস?

—তাতে তোর কী?

—মা ডাকছে।

—কেন?

—মায়ের হাওয়াই চপ্পলটা ছিঁড়ে গেছে। এক জোড়া কিনে আনতে বলল।

–আমার কাছে পয়সা নেই। দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আয়। আমি দাঁড়াচ্ছি। সীতু সত্যিই দৌড়োল।

বুকটায় এক মুঠো আবির কে যেন ছড়িয়ে দিল হঠাৎ। ভিতরটা যেন রঙিন। এক জোড়া হাওয়াই চটি তাকে গঙ্গারামপুর অবধি নিয়ে যাবে। ওইখানে এক মানুষ-জন্তু, এক শ্রমিক-পুরুষ, এক উদাস উদ্যমী তাকে হেলাফেলা করবে বলে বসে আছে নিজের দোকানে। চেনেও না তাকে। না চিনল তো বয়েই গেল। তবু কি আমি তোমার চোখের বালি না হয়ে থাকতে পারি? অবহেলা কি আজকের? সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তো আমরা তোমাদের হেলাফেলার জিনিস! কখনও কখনও আদর করে বুকে তুলে নাও বটে, তার পরই শোঁকা ফুলের মতো ফেলে দাও, আর ফিরেও তাকাও না। তবু আমরা তো বার বার অচ্ছেদ্দা সয়েও তোমাদের জন্যই ফুটে থাকি।

ছুটতে ছুটতেই এল সীতু, তার পিছনে টাইগার। দিদি, আমাকে সঙ্গে নিবি? শেফালি ভ্রূ কুঁচকে একটু দেখল। গায়ে একখানা হলুদ ডোরাকাটা জামা, পরনে হাফপ্যান্ট। রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারা। কী জানি একটু মায়া হল। বলল, চল। মাঝখানে দুটো ঝুড়ি আর ধার ঘেঁষে দু'জনে বসা, তার মধ্যেই ঠেলে ঘেঁষটে ভ্যানগাড়িতে উঠে পড়ল ভাইবোন। সীতু হাসছে, যেমন সব সময়ে হাসে। শেফালি ধমক দিয়ে বলল, দাঁত বন্ধ কর তো। সব সময় হাসি আসে কেন তোর? লোকে বোকা বলবে না?

–চপ খাওয়াবি দিদি?

টাইগার ভ্যানগাড়ির পিছনে ছুটছে। গঙ্গারামপুর অবধি যাবে। যাক। সীতু যে বোকা সেটা টাইগার বুঝতে পারে না। তাই সীতুর সঙ্গে থাকে সব সময়ে।

–ইস্কুল থেকে ফিরে ভাত খাসনি?

–খেয়েছি তো!

–তবে আবার চপ কীসের?

–খাওয়াবি না?

–আচ্ছা খাস।

–দিদি।

–হুঁ।

–আমাকে তোর স্কুলে ভর্তি করে নিবি?

–আমার স্কুলে! পাগল নাকি? আমাদের তো মেয়েদের স্কুল।

–মেয়েরাই ভাল। ছেলেগুলো বড় পিছনে লাগে।

–তুই তো বোকা, সবাই বোকাদের পিছনে লাগে।

–তোর স্কুলে আমাকে নেবে না?

–তাই নেয় কখনও? চুপ কর তো!

–ঠোক্কর মারে যে! এই দ্যাখ না, মাথা ফুলে গেছে।

শেফালি গম্ভীর হয়ে রইল। সীতুটাকে নিয়ে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। ভারী লজ্জা করে। অপ্রস্তুত হতে হয়।

–চুপচাপ বসে থাক। বকবক করতে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সীতু ফের ডাকে, দিদি!

–হুঁ।

–তোর বিয়ে হবে না?

–চুপ কর তো!

–তোর কার সঙ্গে বিয়ে হবে জানিস?

–কার সঙ্গে?

–ফুটুদার সঙ্গে।

–সে আবার কে?

–আছে এক জন।

–তোকে কে বলল?

–আমি জানি।

–ভ্যাট। কোথা থেকে এক ফুটুদা জুটিয়েছে। বোকা কোথাকার। অ্যাই ফুটুদাটা কে বল তো?

–সে আছে।

–মারব থাপ্পড়। কোন বদমাশের পাল্লায় পড়েছিস বল তো! খবরদার ও সব ফুটুদা মুটুদাকে একদম লাই দিবি না।

–ফুটুদা তো খুব ভাল।

–তোর আবার ভাল মন্দ। একটু যদি বুদ্ধি থাকে।

গঙ্গারামপুরে নেমে পড়ল দু'জন। গঙ্গারামপুর এলেই বুকের ভিতরে কী যেন একটু চলকে ওঠে শেফালির। এ বড় দুষ্টু জায়গা। এ বড় পাগল জায়গা। এখানেই মরবে এক দিন শেফালি।

# বেশি দূরে নয় – ০৪

প্রীতমের পর দুটো বোন, তার পর ভাই। তার ভাইটা এখনও বড্ড ছোট। বছর দশেক বয়স। তাই সদর রাস্তার দোকানটায় বাধ্য হয়ে পরের বোনটাকে বসায়। প্রথমে বাবা বিনোদকুমারকেই বসিয়েছিল। কিন্তু বাবা ব্যবসা করবে কী, লোক জুটিয়ে এমন আড্ডা বসাল যে, বিকিকিনি লাটে ওঠার জোগাড়। বাধ্য হয়ে সরস্বতীকে রাজি করাল। সে তো ভয়ে মরে, ও দাদা, আমি যে হিসেবে ভীষণ কাঁচা, কী করতে কী করে ফেলব।

প্রীতম বলল, ঠিক পারবি। শুধু লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে যাবি না। পয়সা গুনতে পারিস তো, তা হলেই হবে।

–কেউ যদি বদমাইশি করে?

–মুখটা মনে রাখবি। তার পর আমাকে বলে দিবি।

এ তল্লাটে সবাই মোটামুটি প্রীতমকে সমঝে চলে। এক সময়ে সে এ ধারে নিজের শাসন কায়েম করেছিল। এখনও লোকে তাকে ঘাঁটায় না।

প্রীতমের পর দুটো বোন, তার পর ভাই। তার ভাইটা এখনও বড্ড ছোট। বছর দশেক বয়স। তাই সদর রাস্তার দোকানটায় বাধ্য হয়ে পরের বোনটাকে বসায়। প্রথমে বাবা বিনোদকুমারকেই বসিয়েছিল। কিন্তু বাবা ব্যবসা করবে কী, লোক জুটিয়ে এমন আড্ডা বসাল যে, বিকিকিনি লাটে ওঠার জোগাড়। বাধ্য হয়ে সরস্বতীকে রাজি করাল। সে তো ভয়ে মরে, ও দাদা, আমি যে হিসেবে ভীষণ কাঁচা, কী করতে কী করে ফেলব।

প্রীতম বলল, ঠিক পারবি। শুধু লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে যাবি না। পয়সা গুনতে পারিস তো, তা হলেই হবে।

–কেউ যদি বদমাইশি করে?

–মুখটা মনে রাখবি। তার পর আমাকে বলে দিবি।

এ তল্লাটে সবাই মোটামুটি প্রীতমকে সমঝে চলে। এক সময়ে সে এ ধারে নিজের শাসন কায়েম করেছিল। এখনও লোকে তাকে ঘাঁটায় না।

ওই দাদা এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় সরস্বতী। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ভারী ব্যাগ নামাচ্ছে প্রীতম। সরস্বতী তাড়াতাড়ি গিয়ে এক পাশটা ধরল।

প্রীতম বলল, ছাড়। মেয়েদের ভারী তুলতে নেই। প্রকাণ্ড এবং ভারী ব্যাগখানা দোকানে তুলে দিয়ে প্রীতম বলল, যতটা পারিস নামিয়ে সাজিয়ে রাখিস। বাকিটা আমি এক সময়ে সাজিয়ে দিয়ে যাব।

সরস্বতী ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা।

তার দেখা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আজ পর্যন্ত দাদা। কী সরল, শিশুর মতো নিষ্পাপ মুখ। পরিশ্রম ছাড়া কিছুই বোঝে না। নিজের পরিবারটি নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দাদার এই জান কবুল লড়াই দেখলে পাষণ্ডেরও চোখে জল আসবে। একখানা ভাল জামা-প্যান্ট নেই। ভাল জুতো নেই। আছে শুধু বাপ-মা আর ভাই-বোনকে আগলে থাকা। দাদার প্রতি মায়ের মতোই গভীর এক ভালবাসা আছে সরস্বতীর। দাদার মতো মানুষ হয় না। এই যে তাদের বাবা বিনোদকুমার সারাটা জীবন পরিবারটাকে ধীরে ধীরে সর্বনাশে নিয়ে যাচ্ছিল, তার জন্যও কখনও বাবার ওপর রাগ করে না তার দাদা প্রীতম। মা তো দিনরাত বাবাকে উস্তমকুস্তম করে ছাড়ে। কিন্তু দাদা ঠিকই বাবার প্রিয় মাছ-তরকারি কিনে আনে। জামা-জুতো কিনে দেয়, সিগারেট-দেশলাইয়ের অভাব রাখে না। প্রীতম বলে, মানুষ যেমনই হোক আমি বিচার করার কে? জন্মদাতা বাপ বলে কথা; বাবা এক মস্ত জিনিস।

আপাত দৃষ্টিতে প্রীতমের শরীরে রাগ নেই। কিন্তু কখনও রাগলে যে সেই রাগ ভয়ংকর তাও সবাই জানে। ল্যাকপ্যাক একটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

—কে রে? কী চাস?

—ফুটুদা নেই?

—ফুটুদাকে কী দরকার তোর?

ছেলেটা বড় বড় দাঁত বার করে হাসছে। কেবল হাসছে।

—এমনি।

—তুই কোন বাড়ির ছেলে?

–ওই স্টেশনের দিকে। লক্ষ্মী রায়ের বাড়ি।

–কী চাস?

–এমনি। এলাম তো, তাই।

–দাদা যে এ দোকানে বসে না, তা জানিস না? মুদির দোকানে বসে। চিনিস? ওই বাঁ হাতে গলির ভিতরে।

ছেলেটা হেসেই যাচ্ছে।

–অমন হাসছিস কেন? নাম কী তোর?

–সীতানাথ। সীতু।

–কোন ক্লাসে পড়িস?

–থ্রি।

–অ্যাঁ! থ্রি কী রে?

–ক্লাস থ্রিতে পড়ি।

–এ বাবা, এত বয়সে মোটে থ্রি! বছর বছর ডাব্বা মারিস বুঝি?

–হ্যাঁ।

সরস্বতী হেসে ফেলল। এমন ভাবে হ্যাঁ বলল যেন গৌরবের ব্যাপার।

–ফুটুদার সঙ্গে তোর কীসের দরকার?

–এমনিই। দিদিকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম ফুটুদার সঙ্গে একটু গল্প করি।

–তাই বুঝি! তা তোর দিদি কে?

–শেফালি। ক্লাস নাইন।

–ও। তুই শেফালির সেই হাবা ভাইটা বুঝি?

–হ্যাঁ।

–হারাবে কোথায়? এইটুকু জায়গায় কি কেউ হারাতে পারে? ভাল করে খোঁজ। কোনও দোকানে বোধহয় কেনাকাটা করছে।

# বেশি দূরে নয় – ০৫

পরশু ইঁদুর মারার ওষুধ আটার গুলিতে মাখিয়ে দোকানের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিল সরস্বতী। আজ মাঝেমধ্যে পচা গন্ধ পাচ্ছে। চারটে ঘেঁষাঘেষি কাচের আলমারি, শো-কেস, বসবার টুল। মেঝেতে অ্যাসিড, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডারের শিশি আর প্যাকেটের সংকীর্ণ পরিসরে মরা ইঁদুর খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। ফুরসুতই বা কোথায়? এই তো, পরপর চার জন খদ্দের আর একঝাঁক বাচ্চা মেয়ে এসে কত কী নিয়ে গেল। বিক্রি হওয়া জিনিসের নাম আর দাম খাতায় টুকতে টুকতে সরস্বতী বলল, অ্যাই, একটা কাজ পারবি?

– কী কাজ?

– করিস যদি বিস্কুট খাওয়াব।

– বলো না, কী করতে হবে?

– মরা ইঁদুর খুঁজে বের করতে হবে। তুই তো রোগা পটকা আছিস। ঠিক পারবি। দেখ না ভাই। ওই আলমারির তলায় টলায় কোথায় আছে। অন্ধকারে কি দেখতে পাবি? দাঁড়া, একটা মোম জ্বেলে দিই।

– আমি খুব ভাল দেখতে পাই। মোম লাগবে না।

সীতু দিব্যি হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে লাগল আনাচ কানাচ। একটু ভয় হল সরস্বতীর। শেফালি যদি জানতে পারে যে তার হাবা ভাইটাকে মরা ইঁদুর খুঁজতে লাগিয়েছে, তা হলে কি দু'কথা শোনাতে ছাড়বে? ছেলেটা তো হাবা, ভাল-মন্দ বোঝে না। কিন্তু, হাবা লোক না থাকলে দুনিয়াটা কি চলে? ওই জন্যেই তো ভগবান দু'চারটে হাবা লোককে দুনিয়ায় পাঠান।

দু'হাতে দুটো মরা ইঁদুরের লেজ ধরে বের করে এনে তার মুখের সামনে দুলিয়ে একগাল হেসে সীতু বলল, এই দুটোই ছিল, আর নেই।

নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সরস্বতী আর্তনাদ করে উঠল, উঁঃ! ফেলে দিয়ে আয় না।

সীতুর ঘিনপিত নেই। নির্বিকার মুখে ইঁদুরদুটোকে নাচাতে নাচাতে দোকানের পিছনে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসে বলল, কাক এসে নিয়ে গেল।

সরস্বতী বলে, ওই কোণে বোতলে জল আছে, হাত ধুয়ে নে তো। তোর বাপু একটুও ঘেন্নাপিত্তি নেই।

– ইঁদুরের বিষ দিয়েছিলে তো? কাকদুটোও মরবে তা হলে।

– মরুক গে। কাঠের বাক্সে সোডা আছে। একটু হাতে নিয়ে ঘষে ঘষে হাত ধুয়ে আয়।

সীতু বেশ বাধ্যের ছেলে। যা বলা হল, তাই করল। আসলে, বুদ্ধি নেই বলেই যে যা বলে তা শোনে।

দুটো ফুকিন বিস্কুট বয়ম থেকে বের করে দিল সরস্বতী। দোকান থেকে কাউকে বিনা পয়সায় কিছু দেওয়া বারণ। তাই নিজের ছোট্ট বটুয়া থেকে বিস্কুটের দাম নিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে দিল।

– খা।

কুড়মুড় শব্দে বিস্কুট দাঁতে ভেঙে সীতু বলল, দিদি তো খাওয়াবে বলেছিল। কোথায় যে গেল!

মনোরঞ্জন মাইতি চানাচুরের প্যাকেট, পরিমল আদক ডিমসুতো, অনাদি দাস থিন অ্যারারুট আর দুটো মেয়ে শ্যাম্পু আর সাবান কিনে নিয়ে গেল।

একটু ফাঁক পেয়ে সরস্বতী বলল, কী বলছিলি যেন?

কাউন্টারের বাইরে এক কোণে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাস্তা দেখছিল সীতু। দিদিকেই খুঁজছিল বোধহয়। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সরস্বতীর দিকে চেয়ে বলল, তোমার ডান কাঁধে একটা টিকটিকি পড়বে।

– অ্যাঁ! টিকটিকি পড়বে কেন রে?

– পড়বে। দেখ।

– দুর পাগল! এ ঘরে একটাও টিকটিকি নেই। আমি টিকটিকি ভীষণ ঘেন্না পাই, বাবা।

– দিদিও পায়। ডান কাঁধে টিকটিকি পড়লে অনেক টাকা হয়।

– দুর বোকা। আমার কাঁধে টিকটিকি পড়বে, তুই কী করে জানলি?

– পড়বে।
– আমার ভয় করে না বুঝি? ভয় দেখাচ্ছিস, না ইয়ারকি মারছিস?
– টিকটিকি কামড়ায় না।
– হ্যাঁ, তুই বড় জানিস কিনা!
ভিড়ের ভিতর থেকে একটা শ্যামলা মেয়ে দোকানের আলোয় এসে দাঁড়াল। বলল, এই হাঁদারাম, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে।
– ফুটুদার খোঁজে এসেছিলাম।
– ফুটুদা! ফুটুদা কে?
সরস্বতী বয়মের আড়াল থেকে মুখ তুলে বলল, আমার দাদা। তোমার ভাই আমার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিল।
শেফালি তার বন্ধু নয়। এক ক্লাস নীচে পড়ে। তবে, চেনা।
শেফালি একটু জড়সড় হয়ে বলল, ও, এই দোকান তো প্রীতম...
– হ্যাঁ, দাদা সময় পায় না বলে আজকাল আমি বসছি।
শেফালি যেন একটু কেমনধারা হয়ে গেল। বলল, ও, তুমি প্রীতমদার বোন! আমি জানতাম না।
এসো না, আমাদের দোকান দেখে যাও।
– এসেছি তো। সীতু তোমাকে বোর করছিল বুঝি?
– না। তবে, ভয় দেখাচ্ছিল।
– ওমা! তাই নাকি?
ঠিক এই সময় ঝপ করে সরস্বতীর ডান কাঁধে নরম মতো কী যেন পড়ল। আর, পড়েই কিলবিল করতে লাগল।
– ও মাগো, এটা কী! কী এটা...
বলেই টুল থেকে লাফিয়ে উঠে কাঁধে একটা ঝটকা মারতেই তার ডান কাঁধ থেকে একটা টিকটিকি কাউন্টারের কাচের ওপর ছিটকে পড়ল।
অবিশ্বাস্য! অবাক চোখে চেয়েছিল সরস্বতী।

– কী হল, কী পড়ল গায়ে? বলে তাড়াতাড়ি দোকানের পাদানিতে উঠে এল শেফালি।
সীতু বলল, টিকটিকি।
সরস্বতী কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তার পর হাঁফ-ধরা গলায় বলল, তোমার ভাইটা...
– ভাইটা কী করেছে?
– বড় অদ্ভুত ছেলে তো! একটু আগেই বলেছিল, আমার ডান কাঁধে নাকি টিকটিকি পড়বে। কী করে বলল, বলো তো?
শেফালি হেসে বলে, ও তো কেবল আবোল তাবোল বকে।
সরস্বতী বড় বড় চোখে এক বার সীতুর দিকে তাকিয়ে ফের শেফালির দিকে ফিরে বলল, তা হলে টিকটিকির কথাটা কী করে বলল, বলো তো! আমার এ দোকানে আমি একটাও টিকটিকি কখনও দেখিনি। আজই প্রথম...
টিকটিকিটা ঝিম ধরে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে তার পর ধীরে ধীরে শো-কেস পার হয়ে দেয়ালে উঠে গেল। দুজনেই দেখল দৃশ্যটা। সীতু নয়। সে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। বিস্কুট খাচ্ছে আর হাসছে।
– ও অত হাসে কেন?
– ওটাই তো ওর রোগ। বকুনি খায় কত, তবু ওর হাসি সারে না। এই বোকাটা, চপ খাবি বলেছিলি না?
– খাওয়াবি?
– চল।
সরস্বতী এই দুই ভাইবোনের কথার মধ্যে পড়ে বলল, দাঁড়াও। আমার আজ খুব ইচ্ছে করছে তোমাদের দুজনকে চপ খাওয়াতে।
শেফালি বলল, না, না। তুমি কেন খাওয়াবে?
– খাওয়ালেই বা! এই সীতু, মাঝেমাঝে আমার কাছে আসবি তো। তুই যা সাংঘাতিক ছেলে, আমাকে আজ ভারী চমকে দিয়েছিস। এসো না শেফালি, দোকানের ভিতরে এসে

বসো। বসার জায়গা আছে। আমি চপের কথা বলে দিয়ে আসছি। ষষ্ঠীপদ দোকানের গরম চপ পাঠিয়ে দেবে।

দোকানের ভিতরে বসবার জায়গা আছে বললে ভুল হবে। একটা ওল্টানো কাঠের বাক্স আছে। বোধহয় সেটাতে উঠে দাঁড়িয়ে সরস্বতী ডিং মেরে উঁচু তাকের জিনিস পাড়ে। ভাইবোন তাইতেই ঘেঁষাঘেষি করে বসল। সরস্বতী চপের কথা বলেই ফিরে এসে বলল, এখুনি আসছে।

চপ খেতে খেতে কত গল্পই যে হল! সরস্বতীর মুখে শুধু তার দাদার কথা। দাদার মতো মানুষ যে হয় না, সেটা শতমুখে বলছিল। কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল শেফালি। হ্যাঁ, শেফালি জানে, পৃথিবীর সেরা পুরুষ ও, প্রীতম। ও রকম আর এক জনও চোখে পড়ল না তার। শেফালি এই দোকানঘরে বসে প্রীতমের গায়ের স্বেদগন্ধ পাচ্ছে। এই দোকানের আনাচে কানাচে তার স্পর্শ। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চপের ডেলা গিলতে পারছে না। একখানা পেটুক ভাইটাকে দিয়ে দিল।

ফেরার সময় শেফালি বলল, অ্যাই, তুই টিকটিকি পড়ার কথা কী বলেছিলি?

– জানতাম, তাই বলেছিলাম।

– তুই তো কেবল আবোল তাবোল বলিস।

– না। আমি টের পেয়েছিলাম। মনে হল, তাই বলেছিলাম।

– তুই তো বলেছিলি, ফুটুদার সঙ্গে নাকি... হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ

– ঠিকই বলেছি।

– কী ঠিক বলেছিস?

– তোর তো ফুটুদার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

– যাঃ, পাজি কোথাকার!

– দেখিস।

হঠাৎ সর্বাঙ্গে শিরশির করল তার। কাঁটা দিল গায়ে। সত্যিই কি সীতু কিছু টের পায়? ওর কথা সত্যিই ফলে? হে ভগবান...

# বেশি দূরে নয় – ০৬

কার্তিক মাসে শীত করার কথা নয়। কিন্তু বিনোদকুমারের আজকাল শীত করে। তাই সে বিকেলে গায়ে একটা আলোয়ান চাপিয়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে ছোট মেয়ে বিম্ববতী। সামান্য সবজিবাজার, তাও আজকাল বইতে পারে না বিনোদকুমার। শরীরটা যে গেছে তা আজকাল বেশ মালুম হচ্ছে। তার নাম ছিল বিনোদবিহারী। পিতৃদত্ত নাম। যাত্রা-থিয়েটার যখন করত তখনই বিহারী ছেড়ে কুমার করে নিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল শিশির ভাদুড়ি, উত্তমকুমারের লাইনে নিজেকে তুলে ধরবে। সংসার-টংসারে মোটে মন ছিল না। বউটা ঘর আগলে পড়ে থাকত আর বিনোদকুমার ইচ্ছে-ঘুড়ি ওড়াতে বেরিয়ে পড়ত। আকাশে মই লাগানোর বৃথা চেষ্টায় জীবনটাই পড়ে গেল হাওলাতে। টাকাপয়সা যে কোন গাছের পাখি সেটা আজ অবধি বুঝতে পারল না সে, তার সঙ্গে চিরকাল ফেরেব্বাজি করে গেল ওই শালার টাকাপয়সা। জুয়োর লাক তার কিছু খারাপ ছিল না, শখ করে তাসে বসলে এক সময়ে বিশ-পঞ্চাশ টাকা আসত। কিন্তু যেই বরাত ফেরাতে কোমর বেঁধে বসল সেদিন থেকেই বরাতও বেইমানি শুরু করে দিয়েছিল।

–ফের বিড়বিড় করছ বাবা?

থতমত খেয়ে বিনোদকুমার বলল, কই? এই তো চুপ করেই আছি।

–ওম্মা গো; পষ্ট শুনলুম যে!

বিনোদকুমার আজকাল প্রায় সবাইকেই ভয় পায়। এমনকী এই এগারো বছরের মেয়ে বিম্ববতীকেও। মেয়েটা কটকটি আছে। তাকানোর মধ্যে মায়াদয়া নেই।

বিনোদকুমার বলল, বিড়বিড় নয়, ডায়ালগ বলছিলুম রে।

–কীসের ডায়ালগ?

–কত নাটকের ডায়ালগ আজও মুখস্থ আছে। সেই সব মনে পড়ে তো, তাই।

–মুখ চেপে বন্ধ করে রাখো। লোকে পাগল ভাববে।

–তা ভাববে কেন? আমি কি পাগল? সবাই চেনে আমাকে।

–চেনে বলেই তো মুশকিল। জোরে হাঁটো তো।

বিনোদকুমার এককালে পরগনার মাঠঘাট তো কম ঠ্যাঙায়নি। লম্বা লম্বা হাঁটাপথ পেরোতে হয়েছে। কখনও জলকাদা ভেঙেছে। কিন্তু এখন শরীরের মধ্যে একটা শীত ঘনিয়ে উঠেছে। হাত পা যেন সিঁটিয়ে থাকে। তাতে জোরবল সবই খামতি পড়েছে।

–তুই এগিয়ে হাঁট না। আমি ঠিক গিয়ে তোকে ধরে ফেলব।

–না, তুমি ফের গিয়ে আড্ডায় বসে যাবে।

–আড্ডা? না, না, সে আর কোথায়? গিরি মল্লিক মরে গিয়ে অবধি আর একটাও ঠেক নেই। বুঝলি? আড্ডা সব উঠে গেছে।

–তোমাকে বিশ্বাস নেই। এসো আমার সঙ্গে সঙ্গে।

তার বউ মালতী মেয়েকে একা ছাড়বে না বলে সঙ্গে তাকে আসতে হয়। নিয়মমাফিক। বাজার করার টাকাগুলো পর্যন্ত তার হাতে দেয় না মালতী। সেটাও বিশ্ববতীর কাছে। তাকে কেউ এখন আর বিশ্বাস করে না।

ফুটু না থাকলে বিনোদ সন্নিসি হয়ে যেত। একমাত্র ওই ছেলেটাই যা একটু মায়া করে তাকে। কিন্তু বিনোদ হাড়ে হাড়ে জানে, এই মায়াটুকু সে অর্জন করেনি, ওটুকু তার ছেলেরই গুণ। একেবারে বাতিল মানুষটাকেও বুঝি ভগবান একটু কিছু দেন, ওই মায়াটুকু।

উড়নচণ্ডী মানুষের এই এক অসুবিধে। ঘরদোর ভাল লাগে না। সংসারের নিত্যদিনের দিন গুজরান বড্ড আলুনি লাগে। সকাল হল তো মশারি খোলো, বিছানা ঝাড়ো, ভাত বসাও, কুটনো কোটো, ফাঁকে ফাঁকে ক্যাট ক্যাট করে শতেক কাজ-অকাজের কথা শোনো আর চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খাও। ঘর, উঠোন, বাগান ব্যস। তার পর সংসারের সীমানা শেষ। এই যে বাইরের দুনিয়াটার খোলামেলা সীমানাহীনতা এতেই বিনোদ আজও বড় স্বস্তি বোধ করে। তবে বয়স আর শরীরের অক্ষমতা তার একটা সীমানা বেঁধে দিয়েছে। লম্বা দড়ি পরানো আছে গলায়, খুঁটো টেনে রাখে।

–হাঁফ ধরছে কেন রে?

–কার হাঁফ ধরছে? তোমার?

–জোরে হাঁটতে বলিস, আমি কি পারি?

–একটু দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নাও। বাজার তো এসে গেছে।

–হাঁটুতে জোর নেই মোটে। শচীর দোকানে বরং একটু বসি।

–ওমা! ও তো সেলুন। কুচি কুচি চুল উড়ছে সব সময়ে।

–আমিও বরং খেউড়িটা হয়ে নিই। গালে দাড়ি বিজবিজ করছে। ততক্ষণ একটু বসাও হবে।

–তা হলে যাও, হলে দিদির কাছে গিয়ে দোকানে বসে থাকো। যাওয়ার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।

ওটা ভাঁওতাবাজি। সবজি বাজারের মতো ভ্যাতভ্যাতে জিনিস আর নেই। কাল শনিবার। তার বউ মালতী শনিবারটা হেঁসেলে মাছ ঢুকতে দেয় না। নিরামিষ কি গলা দিয়ে নামে বাপ? শনিবার এলেই তার মনটা নেতিয়ে পড়ে।

খদ্দের ছিল বলে একটু বসতে হল। তা হোক, বসাই তো চায় বিনোদ। বাজারে তার বিস্তর চেনা মানুষ। বয়সের মানুষরা অবশ্য আর গুনতিতে বেশি নেই। ফিফটি পারসেন্ট টেঁসে গেছে। যারা আছে তাদেরও অনেকেই খাড়া নেই। কেউ শয্যাশায়ী, কেউ বা মরো-মরো। দু'চার জন যা আছে, ঘোরাফেরা করে তাদের সঙ্গে এই জায়গাতেই যা দেখা হয়ে যায়।

বসে একটা সিগারেট ধরাল বিনোদ। পাশে বসা লুঙ্গি- পরা একটা হাড়গিলে লোক বিড়ি খাচ্ছিল। কাঁচা-পাকা চুল, গালে পাতলা দাড়ি, নাকের নীচে ভুঁড়ো গোঁফ। কয়েক বার তেরছা চোখে চেয়ে দেখল তাকে। তার পর হঠাৎ বলল, বিনোদ না?

বিনোদ একটু অবাক হয়। নাম ধরে ডাকে কে রে বাবা? বয়সের একটা সম্মান নেই?

–কে হে তুমি?

–আমি রজব আলি। বীরশিবপুর। মনে পড়ে?

তাই তো! রজবের সঙ্গে এক সময়ে বেশ মাখামাখি ছিল তার। আলকাপের দল ছিল রজবের। গলা দরাজ। কত আসর মাত্ করেছে।

বিনোদ বলে ওঠে, দিব্যি তরতাজা আছ তো! বুড়ো হওনি কেন?

—আমাদের কি বুড়ো হলে চলে! খেটেখুটে খেতে হয়।
—তবে আমি বুড়ো হলাম যে?
—তাই নাকি? তোমার আমার তো একই বয়স। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। তা তুমি আগ বাড়িয়ে বুড়ো হতে গেলে কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?
—বড় চিন্তায় ফেলে দিলে মিঞা।
—কেন চিন্তাটা কীসের তোমার?
—চিন্তা হবে না? ঘরে বসে বসে কেবল ভাবি, বুড়ো হচ্ছি, বুড়ো হচ্ছি। আর ভাবতে ভাবতে হাতে-পায়ে বুড়োটে ভাবও এসে গেল। এই যে হঠাৎ তোমাকে দেখছি, দিব্যি তরতাজা আছ। তাই মনের মধ্যে একটা টানা-হ্যাচড়া পড়ে গেল।
—ওরে বাপু, বুড়ো তো আমারই আগে হওয়ার কথা। ছেলেগুলো মানুষ হল না তেমন। বড়টা বোকাসোকা, মেজো জন ভ্যান চালায়, পরেরটা কী করে বেড়ায় আল্লা জানে, ছোট জন ওর মধ্যেই একটু ভাল। মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে যায়। আর তোমার দেখ, ছেলেখানা জব্বর দাঁড়িয়েছে। ফুটুর কথা সবাই বলাবলি করে। তোমার চিন্তা কীসের হে?
—তাই ভাবছি। সব ওলট-পালট করে দিলে হে। এখন আবার ফিরে সব হিসেব-নিকেশ করতে হবে।
—ওই দেখ। এতে আবার হিসেব নিকেশের কী?
—এই বয়স-কাল, অবস্থা-ব্যবস্থা। নিজেকে জরিপ করা বড় শক্ত কাজ হে, রজবভাই।
দাড়িটা আর কামানো হল না। গালে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে পড়ল বিনোদ।
—চললে কোথায় হে?
—একটু দেখি, মেয়েটা কোথায় গেল। বাচ্চা মেয়ে দেখে দোকানিরা কী গছিয়ে দেয় কে জানে।
আসলে বিনোদের এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। একটু আগে যেন গা থেকে একটা ভেজা কম্বল সরিয়ে নিয়েছে কেউ। এখন আর শীত করছে না তেমন। গায়ের আলোয়ানটা খুলে ভাঁজ করে কাঁধে ফেলল সে।

ভিড়ের ভিতরে একটা রোগা ছেলে আর যুবতী মেয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটা বলে উঠল, ওই দেখ দিদি, ফুটুদার বাবা। মেয়েটা ভারী অবাক চোখে তাকাল বিনোদের দিকে। তাকানোটা ভারী ভাল লাগল বিনোদের। আজকাল তো আর কেউ তাকায় না। উচ্ছিষ্টের মতো পড়ে আছে এক ধারে। না, দিনটা আজ ভালই গেল।

# বেশি দূরে নয় – ০৭

বুক চিতিয়ে সপাটে খানিক হাঁটার পরই বিনোদকুমার বুঝল, বুড়োবয়সকে খুব বেশি পিছনে ফেলতে পারেনি। পোষা কুকুরের মতো গা শুঁকতে শুঁকতে পিছন পিছন আসছে। টের পেল, যখন হাঁফ ধরে যাওয়ায় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিতে হচ্ছিল। ওরে বাপু! যৌবনপ্রাপ্তি কি আর ছেলের হাতের মোয়া? বয়স তেমন ভাঁটিয়ে যায়নি, কিন্তু শরীরের জোয়ার নেমে গেছে। বয়সকালে নেশাভাঙও তো কম করেনি! তার ওপর এই ফুক ফুক রোজ ডজনখানেক সিগারেট ফোঁকা– এরও তো মাশুল আছে, নাকি? মাশুল মেলাই দিতে হচ্ছে বিনোদকে। কতক জানিত কর্মফল, কতক অজান। আটন গেট-এ তার এক জন মেয়েমানুষ ছিল, এক জন ছিল ফুলেশ্বরে। সব্বার নামও মনে নেই। পাপটাপ যখন করেছে, তখন পাপ জেনেই করেছে। তবে মনস্তাপ ছিল না। একটু আধটু তো ও রকম হবেই বাপু! তখন বিনোদের চেহারাখানা কী ছিল বলো! নদের নিমাই করে কত বুড়োবুড়ির চোখে জল এনে ফেলেছিল। কত বুড়ি পালার পর পায়ের ধুলো নিয়ে যেত।

বিনোদ টের পেল, বয়সটা তার পায়ের গোছের কাছেই বসে আছে। তাড়ালেও যাবে না। অথচ হিসেবের বয়স তার হয়নি।

–বিনোদ নাকি রে? এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

বিনোদ দেখল, সামনে সফলরাম। তা সফলই বটে। গঙ্গারামপুরের সব ক'টা টাকাওলা লোককে পাল্লার এক ধারে, আর সফলরামকে অন্য ধারে চাপালে সফলের দিকেই পাল্লা মাটিতে ঠেকবে।

–এই মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

–তা দাঁড়িয়ে থাকবি তো থাক না! বিড়বিড় করে কাকে গাল দিচ্ছিস?

বিড়বিড় করছে নাকি সে? ওই এক মুশকিল হয়েছে আজকাল। সে টের পায় না, কিন্তু লোকে দেখতে পায়। সে নাকি একা একা বিড়বিড় করে। তা করে হয়তো, কিন্তু সেটা টের পায় না কেন সেটাই বুঝতে পারে না বিনোদ।

—গাল দিচ্ছি না দাদা, নানা কথা ভাবছি আর কী!

—পষ্ট দেখলুম হাত-পা নেড়ে কথা কইছিস! বলি লোককে শাপ-শাপান্ত করিস না তো?

—কী যে বলেন দাদা!

—বিচিত্র কী! ঘর-বসা লোকের মনে মেলা গাঁদ জমে থাকে তো!

প্রকৃতির নিয়মেই বড়লোকদের সামনে বিনোদ ভারী দুর্বল বোধ করে। মনের জোরটা পায় না। টাকার জোরের কাছে কোন জোরটাই বা খাটে বাপু? সে একটু হেঃ হেঃ করে বলল, ঘর-বসা না হয়ে উপায়ই বা কী বলুন? শরীরটা জুত-এর নেই।

—তাই থাকে রে পাজি? তুই তো চিরকালের নষ্ট! এইটুকুন বেলা থেকে দেখে আসছি। তবে তোর কপালটা বড্ড ভাল।

সসম্ভ্রমে চুপ করে থাকে বিনোদ। সফলরাম নিজেই বলে, তুই নষ্ট হলেও ছেলেটা তোর ভাল। তোর মতো লপেটা-বাবু নয়। করে-কর্মে দাঁড়িয়ে গেছে।

—তা আপনাদের আশীর্বাদে।

—এটা কলিযুগ জানিস তো! এ যুগে আশীর্বাদও ফলে না, অভিশাপও ফলে না। এ হল নগদা-নগদির যুগ, যেমন করবি তেমনি পাবি। জুয়োর দান ধরে নেংটি-ঘটি সার করলি, এখনও চোখ খুলল না? আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ সব বাজে কথা। ছেলেটা যে তোর মতো হয়নি সেইটেই তোর কপাল।

তা বিনোদ এ সব কথাও বিস্তর শোনে। ঘরে, বাইরে, পথেঘাটে। বউ শোনায়, আত্মীয়স্বজন শোনায়, উটকো লোকও শোনায়। কিছু ভুলও শোনায় না। হ্যাঁ, তার ছেলেটা ভাল, আর সে খারাপ। তা বাপু, তাতে হলটা কী?

কী একটা কথা বলছিল সফলরাম, ধরতাইটা ঠিকমতো শোনেনি। কানের দোষই হবে বোধহয়। শেষটা শুনতে পেল, আমি বাপু রাজি হইনি।

—কথাটা কী হচ্ছিল দাদা?

–তোর ছেলের কথাই হচ্ছিল। আমার বউমা বলছিল, ফুলির সঙ্গে ফুটুর সম্বন্ধ করলে কেমন হয়! আমি বলে দিয়েছি, ও লাইনে মোটেই চিন্তা কোরো না। ছেলে ভাল হলে কী হবে, বিনোদেরই তো রক্ত। রক্তে রক্তে কোন বিষ অর্শায় তার ঠিক কী! তোর কাছে বলেছে কিছু?

ব্যাপারটা স্পর্ধারই সামিল। জিভ কেটে বিনোদ বলল, আজ্ঞে না, ও রকম কোনও কথা হয়নি মোটেই।

–আর হবেও না। বারণ করে দিয়েছি। আগেভাগেই জানিয়ে রাখা ভাল, নইলে আবার একটা প্রত্যাশা থাকবে তো!

না, বিনোদের কোনও প্রত্যাশা নেই। বউ মানেই একটা ফ্যাকড়া, একটা বাধক। বউ-বাচ্চার জন্যই না বিনোদের দুই নৌকোয় পা রেখে জীবন কাটল! ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে সে বলে, না, না, তা হয় না। ঘাড়ে দু-দুটো আইবুড়ো বোন, জুয়াড়ি বাপ, কে যে বউমাকে বুদ্ধিটা দিল কে জানে!

সফলরাম ঠোঁটকাটা লোক সবাই জানে। বিনোদের মোটেই রাগ বা অপমান হল না। সে দিব্যি হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সে তো বটেই। সফলরাম চলে যাওয়ার পরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল বিনোদ। তার একটু ভয় হচ্ছে। ফুটু বিয়ে বসলে তার নতুন বিপদ দেখা দেবে। বউ এসে যদি বাড়ি-ছাড়া করে, তা হলে তাকে এই বাজারেই ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে।

–ও বাবা!

চটকা ভেঙে বিনোদ দেখে, সামনে বিম্ববতী।

–চল মা, বাড়ি চল। বাজার হয়েছে?

–হ্যাঁ।

–দে, একখানা ব্যাগ বরং আমাকে দে।

–আমি পারব। তুমি চলো তো!

বুকটা ধকধক করছে। এখনও হাঁফটা পুরোপুরি কাটেনি। বয়স হয়েছে কী হয়নি, তা ঠিক বুঝতে পারছে না বিনোদ।

# বেশি দূরে নয় – ০৮

ডালের বস্তার ওপর টং-এ বসে এক্সারসাইজ খাতায় হিসেব করছিল প্রীতম। বাহ্যজ্ঞান নেই। হিসেব করতে তার বড় ভাল লাগে। আর ব্যবসার প্রাণই হল হিসেব। আগে হিসেবের কায়দাটা ভাল জানা ছিল না তার। মণিরাম শিখিয়েছে। বলেছে, হিসেবটা যদি ঠিকমত করতে পারিস তো ভিত বেঁধে ফেললি। ওইখানে ভুলচুক করলে দর ফেলতে গড়বড় হয়ে যাবে। তা হলেই সর্বনাশ।

দোকান সামলাতে পরেশকে রেখেছে সে। মাইনে দিয়ে লোক রাখার মতো তালেবর সে এখনও হয়নি। পরেশ এক রকম যেচে এসেই আগ বাড়িয়ে দোকানের ভার নিয়েছে। তার মুশকিল হল, থাকার জায়গা নেই। ট্রাকের খালাসি ছিল। গড়বড়ে জিনিস লোড হত ট্রাকে। ড্রাইভার আর তার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। আর সেই সময়টায় পেচ্ছাপ করতে নেমেছিল বলে বেঁচে যায় পরেশ। সেই থেকে পালিয়ে আছে। ঘনশ্যাম ব্যাপারি পাইকার। তারই কেমন একটু আত্মীয় হয় বলে ঘনশ্যামই এক দিন এসে গছিয়ে গেল। বলল, কটা দিন থাকতে দাও। ও বেচারার দোষ নেই, সাতে-পাঁচে ছিলও না, ফেঁসে গেছে ঝুটমুট। গণ্ডগোল থিতু হলে ফিরে যাবে। চুরিটুরি করলে আমি জামিন আছি।

সেই থেকে পরেশ আছে। ছেলে কিছু খারাপও নয়। দু'বেলা ঘনশ্যামের বাড়িতেই খেয়ে আসে। দিনে পাঁচ টাকা করে হাতখরচ দেয় প্রীতম। সুবিধে হল, সে মাল আনতে গেলে দোকানটা চালু রাখে পরেশ। খদ্দের ফিরে যায় না। রাতে চাল-ডালের বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমায়। কিন্তু মুশকিল একটাই, সর্বদা একখানা দুঃখী মুখ চোখের সামনে দেখতে প্রীতমের মোটেই ভাল লাগে না। চোখটাও যেন সব সময় কান্নার আগে ছলোছলো মতো হয়ে থাকে। কথা বিশেষ কয় না। ভারী চুপচাপ আর মনখারাপ। এইটেই কেমন যেন সহ্য হতে চায় না প্রীতমের।

চাপাচাপি করায় এক দিন কেবল বলেছিল, কত দূরে দূরে চলে যেতুম তো, সেইটে ভেবে কষ্ট হয়। দুনিয়ায় হরেক রকমের চিড়িয়া, কার যে কীসের ওপরে টান তা বোঝে কার বাপের সাধ্যি। টাকা-পয়সার আমদানি নেই, ছুটি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু দূরে দূরে যাওয়ার আনন্দ আবার কেমনধারা, কে জানে বাপু! একটা রোগাভোগা চেহারার ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছিল, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে দেখা যাচ্ছিল না।

—এটা কি ফুটুদার দোকান?

পরেশ কী বলল, বোঝা গেল না।

—সীতু নাকি রে? বলে বস্তার ওপর থেকে নেমে এল প্রীতম।

—ভেতরে আয়।

—তুমি আর পিউ স্টোর্সে বসো না?

—দু' দুটো দোকান সামলানো কি সোজা? ওটাতে সরস্বতী বসে।

—এ দোকানটাও তোমার?

—হ্যাঁ, জিলিপি খাবি?

—না, সরস্বতীদি তো খাইয়েছে।

—তাই বুঝি?

—দুটো।

প্রীতম হাসল। বোকা ছেলেটা অল্পেই ভারী খুশি হয়।

—আমার হিসেবের খাতাটা একটু দেখে দে তো। দিবি?

—দাও না।

প্রীতম ওকে এক্সারসাইজ খাতাটা ধরিয়ে দিল। সিল করা তেলের টিনের ওপর নিজেই একটা বস্তা ভাঁজ করে পেতে বসে গেল সীতু। সে আর কিছু না পারলেও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগটা খুব পারে। কখনও ভুল হয় না। অন্য বিষয়ে ডাব্বা খেলেও অঙ্কে আশি নব্বই পায়।

প্রীতমের হিসেবে কখনও ভুল হয় না। তবু এক জোড়ার চেয়ে দু জোড়া চোখ সব সময়েই ভাল। আর সীতুর যে অঙ্কের মাথা পরিষ্কার এটা সে ভালই জানে। আর শুধু অঙ্কই নয়,

সীতুর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার আছে। সে যখন পিউ স্টোর্সে বসত তখন এক দিন জিলিপি খেতে খেতে সীতু বলেছিল, তোমার দাঁড়িপাল্লা নেই?

–না, স্টেশনারি দোকান তো, তাই দাঁড়িপাল্লা লাগে না।

–দাঁড়িপাল্লার দোকান আমার খুব ভাল লাগে।

সেই দাঁড়িপাল্লার দোকান হল এইটে। আর বলতে নেই, এই দোকানে প্রীতম মা লক্ষ্মীর পায়ের মলের শব্দও যেন শুনতে পায়। এই দোকান করেই সে ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় শোধ করে এনেছে।

–ও সীতু?

–উঁ!

–দাঁড়িপাল্লার দোকানটা তোর পছন্দ হয়েছে?

–ও লোকটা কে?

–ও পরেশ। কেন রে?

–এমনি। ও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

–তাই নাকি? তোকে চেনে না তো, তাই। আর তাড়াবে না।

–তোমার হিসেব ঠিক আছে। ভুল নেই।

খাতাটা প্রীতমের হাতে দিয়ে উঠে পড়ল সীতু।

–কোথায় চললি?

–দিদিকে খুঁজতে। নগেনের দোকানে ঢুকেছে।

–ওই তো নগেনের দোকান। খুঁজতে হবে কেন, বেরোলেই দেখতে পাবি।

–দিদি বেরোবে না। আমি বেরোলে, তার পর বেরোবে।

–তাই নাকি? কেন রে?

–কী জানি। বলল, তুই প্রীতমদার দোকানে গিয়ে বসে থাক। তুই বেরোলে আমিও বেরোবো।

–তোর দিদিটা কে বল তো?

–শেফালি। ক্লাস নাইন।

—তা হবে, আচ্ছা আজ যা, আবার আসিস।

সীতু চলে গেলে প্রীতম চুপচাপ বসে রইল। সীতুকে দেখে নগেনের দোকান থেকে যে মেয়েটা বেরিয়ে এল তাকে এই সুঁঝেকা আঁধারে ভাল দেখতে পেল না প্রীতম। এ দিকে একটু তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তার পর সীতুর সঙ্গে চলে গেল। সন্ধের মুখে খদ্দেরের আনাগোনা বেড়ে গেল খুব। গলির দোকান হলে কী হয়, বিক্রিবাটা খুব ভাল। প্রীতমের কোনও দুঃখ নেই এখন।

পরেশের দোকানদারির অভিজ্ঞতা নেই। চটপটেও নয়। তাই সন্ধের মুখটায় প্রীতমকেই হাত লাগাতে হয়। মুদির দোকানের বিক্রির হিসেব রাখা মুশকিল। শশী পাল কেরোসিন, ব্লেড আর ন্যাপথলিন নিয়ে গেল তো বাসন্তী আড়াইশো সর্ষের তেল, কালোজিরে আর গোলা সাবান। নিত্যানন্দ একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে হাওয়া হল তো শ্রীপতি এল কাঠকয়লা, গরুর দড়ি আর শটিফুড কিনতে। হিমসিম অবস্থা।

ওরই মধ্যে টুলে বসে রোজকার মতো ফুট কেটে যাচ্ছে হরিপদ দাস, বলি, তোর কি মাথায় কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই! দোকান করলেই হবে? সরস্বতীর তো বাপু সতেরো আঠারো হল, চেহারার চটক থাকতে থাকতে বিয়ে লাগিয়ে দে। সুমন্ত কি খারাপ পাত্তর রে? বারো বিঘে জমি, রাইস মিল, মুড়ি-কল। পছন্দ নয় তো, সুধীর রায়ও আছে। আদালতের বাঁধা সরকারি চাকরি। হোক পিওন, সরকারি চাকরি বলে কথা। বাগনানে পাকা বাড়ি।

কথা কওয়ার সময় নেই, কিন্তু শুনে যেতে হচ্ছে। তবে, প্রীতম বিরক্ত হয় না। হরিপদরও দোষ নেই। পেট চালাতে নানান ধান্দা করে বেড়াতে হয়। জমি-বাড়ির দালালি, ঘটকালি, দরখাস্তর মুসাবিদা, কাউকে ফেলে না প্রীতম, 'দূর ছাই' করে না, তার সর্বদা তৃষ্ণী ভাব। এক জন ঝাঁ চকচকে বউ মানুষ এসে দাঁড়াল। শশব্যস্তে বসা থেকে উঠে পড়ল প্রীতম। বাপ রে! সাব ইন্সপেক্টর বরেন মজুমদারের বউ, বন্দনা মজুমদার।

—চাওমিন আছে?

—আছে বউদি।

—লোকাল মেড নয় কিন্তু।

—আজ্ঞে না, ব্র্যাণ্ডেড মাল।

—আর সয়া সস, চিলি সস?

—আছে বউদি।

মহিলার হাবভাবই অন্য রকম। এ জায়গার সঙ্গে মেলে না। যেমন চেহারার চেকনাই, তেমনই আদবকায়দা। জিনিসগুলো খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখল। তার পর বটুয়া খুলে দাম দিয়ে দিল।

—আপনি আজকাল পিউ স্টোর্সে বসেন না?

—না, আমার বোন বসে।

—হ্যাঁ, সে দিন আইলাইনার চাইলাম, খুঁজেই পেল না।

কাচুমাচু হয়ে প্রীতম বলে, নতুন তো, তাই। আমি বরং বাড়িতে আইলাইনার পৌঁছে দেব।

—দরকার নেই। আমি আনিয়ে নিয়েছি। আপনি যখন বসতেন তখন পিউ স্টোর্সে মেয়েদের খুব ভিড় হত। আজকাল হয় না। আপনি মেয়েমহলে বেশ পপুলার, তাই না?

প্রীতম লজ্জার হাসি হেসে বলল, মেয়েদের জিনিসপত্র রাখি তো, তাই। মুখ টিপে একটু হেসে বন্দনা চলে গেল। হরিপদ পিছন থেকে ফুট কাটল, জব্বর কাস্টমার পেয়েছিস।

—সব কাস্টমারই সমান।

—এম এ বি টি, বুঝলি? কিন্তু আজও বাচ্চা বিয়োতে পারেনি।

# বেশি দূরে নয় – ০৯

মেয়েরা কি শুধু বাচ্চা বিয়োনোর যন্তর নাকি?

–তা নইলে বিয়োবে কে? পুরুষমানুষ আর সব পারে, ওইটে পারে না। বুঝলি রে? যে-মেয়ে ওইটে পারে না, সে যতই তড়পাক, মেয়ে-জন্মই বৃথা। পুরিয়ায় করে একটু ইসবগুল দে তো দেখি। আজ মোটে ক্লিয়ার হয়নি। পেটটা থম মেরে আছে।

ইসবগুল সস্তা জিনিস নয়, তাই প্রীতম শশী কবরেজের করা ত্রিফলার গুঁড়ো খানিকটা পুরিয়া করে দিয়ে বলল, এইটে মেরে খাও গে, সকালে বগবগ্ করে নেমে যাবে।

নির্বিকার মুখে পুরিয়াখানা জামার ঝুলপকেটে ঢুকিয়ে হরিপদ বলে, দু-দুটো কারবার ফেঁদে বসলি, আমদানিও তো ভালই দেখছি। এই বেলা একটা পলিসি করিয়ে নিবি নাকি! ধর হাজার পঞ্চাশ। প্রিমিয়ামও গায়ে লাগার মতো নয়।

প্রীতম একটু হেসে বলল, তুমি কি পোড়াচোখে আর কাউকে দেখতে পাও না? এখনও ভরপেট ভাতের পাকা ব্যবস্থা হয়নি, এর মধ্যেই ওসব লাখ-বেলাখ এনে ফেলছ?

–ওরে, তোরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, না কি? বিয়ে করবি, সংসার হবে, তখন....

–কে বলল আমার ভবিষ্যৎ আছে? ও সব আমার নেই। আমি শুধু আজকের দিনটা বুঝি। কাল ভোর হলে কালকের কথা ভাবতে লাগব। আগ বাড়িয়ে কবে কী হবে তা নিয়ে মাথা গরম করতে যাব কেন?

প্রীতমের গলায় একটু ঝাঁঝ ছিল। তাইতেই হরিপদ চুপ মেরে গেল। টোপটা খেল না। বেশির ভাগই খায় না। তা বলে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না হরিপদ। কথা পাল্টে সে বলে, হ্যাঁ রে! মোদকের মধ্যে কি হেরোইন থাকে?

প্রীতম ভ্রূ কুঁচকে বলে, হেরোইনের দাম জানো?

–কে যেন বলছিল, শশী কবরেজের মোদকে হেরোইন আছে।

–তোমার মাথা।

–আমিও তাই ভাবছি, হেরোইন থাকলে মোদক এত সস্তা হয় কী করে?

গোপাল মাইতি এসে একখানা বড় ফর্দ দাখিল করে বলল, মেপে রাখ, আধ ঘন্টা বাদে নিয়ে যাব। তাড়া আছে। প্রীতম আর পরেশ ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হরিপদ আক্ষেপ করে আপনমনেই বলতে লাগল, আহাম্মক আর কাকে বলে! ওর নাকি আখের বলেই কিছু নেই। দুনিয়ার মানুষ আখের গোছানোর জন্য হাঁসফাঁস করে মরছে, তারা কি সব বোকা? দশ-পনেরো বছর বাদে যখন গোছা গোছা টাকা পেতিস তখন বুঝতিস পলিসি কী জিনিস। তা নাহয় না-ই করলি, শেয়ার বাজারেও লাগাতে পারিস কিছু। মন্দা বাজারে ধরলি, তেজি বাজারে ছাড়লি, গায়ে হাওয়াটি লাগল না। হাতে বাণ্ডিল বাণ্ডিল চলে এল।

—কথা কমাও হরিদা। কথা বেশি কও বলেই তোমার হাওয়া বেরিয়ে যায়, আজ অবধি কাজের কাজ একটাও করে উঠতে পারলে না।

হরিপদ মোটেই রাগ করল না। নির্বিকার মুখে বলে, ওরে, এ বার হাওয়া ঘুরবে, দেখিস।

—তাই নাকি?

—শাশুড়ি মরো-মরো।

—মরলে কি তুমি গিয়ে খন্যাডিহিতেই গেঁড়ে বসবে নাকি?

—খন্যাডিহি ভাল জায়গা। ফুলের চাষ হয়। ফসলে আর ক'টা টাকাই বা থাকে। ফুলের চাষ সারা বছর। গত বারই তো শুনেছি শাশুড়ি চল্লিশ হাজার টাকার ব্যবসা করেছে। দেখাশুনো করার লোক থাকলে আরও হত।

প্রীতম জানে হরিপদ এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। শাশুড়ি মরলে খন্যাডিহি যাবে বটে, কিন্তু দু'দিনেই সব বেচেবুচে দিয়ে ফিরে আসবে। তার পর টাকাটা উড়িয়ে ফের এই রকম সন্ধেবেলায় এসে তার দোকানে বসে লেজ নাড়বে। কিছু লোকই থাকে ও-রকম, যারা উড়িয়ে যত সুখ পায় তত আর কিছুতে নয়।

হরিপদর মধ্যে তার বাবা বিনোদকুমারের একটা আদল আছে। জলের ফেনার মতো ভেসে যেতে বড় সুখ পায়, কিছু ঘটিয়ে তুলতে পারে না। কেউ জুয়ার বাজি ধরে, কেউ শাশুড়ির মরার জন্য অপেক্ষা করে, কেউ অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকে। রাত ন'টা নাগাদ দোকানের ঝাঁপ ফেলল প্রীতম। বিক্রিবাটার টাকা গুনেগেঁথে ব্যাগে ভরল। তার পর উঠে পড়ল।

—চলি হে পরেশ।

—হুঁ।

সাইকেলখানার ওপর কম রগড়ানি যায় না। তবে, প্রীতম জিনিসের সঙ্গে ভাবসাব করতে জানে। রোজ ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মোছে, তেল দেয়। তা ছাড়া, দরকার মতো মেরামত করিয়ে নেয়। নিতাই পোদ্দারের কাছ থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছিল। দিব্যি চলছে। আরও বছর দশেক চালিয়ে দেবে সে। মোড়ের কাছে এসে দেখল সীতু শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে, বাড়ি যাসনি?

—রিকশা পাচ্ছি না যে!

—কেন, রিকশার অনটন কীসের?

সীতু একগাল হাসল, সব নাকি ধান তুলতে চলে গেছে। কাল সকালে ফিরবে।

—তা হেঁটেই মেরে দে না। একটুখানি তো পথ।

—দিদি পারবে না যে!

—দিদি! তোর দিদি কোথায়?

—ওই যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফুচ্‌ফুচ্‌ করে কাঁদছে। মা বকবে তো তাই।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল প্রীতম। তাই তো! এরা তো বেশ আতান্তরেই পড়েছে। পথটা পুরুষের পক্ষে বেশি নয় বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে বোধহয় বেশিই। তা ছাড়া বিপদ-আপদ ঘটতে পারে।

—তুই সাইকেল চালাতে পারিস না?

—পারি তো।

—তা হলে দিদিকে চাপিয়ে নিয়ে চলে যা আমার সাইকেলে। ফেরত দিতে হবে না। কুতুবের দোকানে জমা করে দিস।

—আমি জানতাম।

—কী জানতিস?

—আজ আমি তোমার সাইকেলটাতে চাপব।

কথাটা বিশ্বাস হয় প্রীতমের। সবাই বোকা বলে বটে, কিন্তু ছোঁড়াটার মধ্যে একটা কিছু আছে। ভগবান নানা বিচিত্র জিনিস দুনিয়ায় পাঠান, কার মধ্যে ঝাঁপি থেকে কী বেরোয় কে জানে বাবা! ও পাশ থেকে শেফালি চাপা স্বরে ভাইকে বলল, না, না, আমি তোর সাইকেলে চাপব না, ফেলে দিবি।

সীতু বলে, আচ্ছা, একটুক্ষণের জন্য উঠেই দেখ না!

—না বাপু, তুই তো রোগাভোগা ছেলে।

চাপাচাপিতে নিমরাজি হল মেয়েটা। উপায়ও নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে রডে বসিয়ে কেত্রে ফেত্রে উঠে পড়ল সীতু। কিন্তু সাইকেল টলোমলো করছে। দশ হাত যেতে না যেতেই ঝপাং করে রাস্তার গর্তে পড়ে কাত হল। দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি। প্রীতম গিয়ে সীতুকে তুলল। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে নিজেই উঠে পড়ল টপ করে, ফেললি তো! হাঁদারাম কোথাকার!

—ব্যথা পেয়েছিস দিদি?

—না, লাগেনি।

তীক্ষ্ণ চোখে সাইকেলখানা পরখ করছিল প্রীতম। না, চোট হয়নি, ঠিকই আছে। বলল, সাইকেল ছাড়া তো উপায় নেই। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। শেফালি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ও তো পারবে না। আবার ফেলে দেবে।

—ঠিক আছে, তোমরা দু'জন রড আর ক্যারিয়ারে বসে যাও, আমি ঝট করে নামিয়ে দিয়ে আসছি। পারবে তো? ভয় করবে না?

শেফালি চুপ। সীতু বলল, খুব পারব। চল রে দিদি।

শেফালির আর কোনও আপত্তি হল না। সীতু উঠল রডে, শেফালি ক্যারিয়ারে। একটু একটু হিমেল বাতাসে আলোছায়াময় রাস্তায় সাইকেলখানা মসৃণ গতিতে ছুটছে। দুই শক্তিমান হাতে হ্যাণ্ডেল ধরা, চওড়া পিঠের আড়াল, শেফালির শরীর আর মন শিউরে শিউরে উঠছে। স্বপ্নের পুরুষ এত কাছে এলে কি বাঁচে কোনও মেয়ে? সে তো মরে যাচ্ছে! হে ভগবান, এটা যেন আমার স্বপ্ন না হয়। যা দুষ্টু তুমি। সুখ ভণ্ডুল করে দিতে তোমার জুড়ি আর কে?

# বেশি দূরে নয় – ১০

মধ্যরাতে যৌবন ফিরে পেল বিনোদকুমার। কালীচরণের ঠেক থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে সে যৌবনটাকে বেশ টের পাচ্ছিল। মনটা একেবারে চলকে চলকে যাচ্ছে, কানায় কানায় ভরা যে! আকাশের দিকে তর্জনী তুলে সে ভগবানকে বলল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ...

আশপাশটা একটু দেখেও নিল বিনোদ। বুড়ো বয়সটা নেড়ি কুকুরের মতো পায়ে পায়ে লেগে আছে নাকি? না, নেই। বুড়ো বয়সটা তাড়া খেয়ে হাওয়া হয়েছে। বিনোদের মনটা বড় খারাপ ছিল আজ। ওই যে সফল শালা কী কতগুলো কথা নাহক শুনিয়ে দিল, কাজটা কি উচিত হয়েছে ওর? কত বড় কেউকেটা রে তুই? অ্যাঁ! বড়লোক আছিস থাক না। তোর টাকায় পেচ্ছাপ করে এই বিনোদ।

ভিতরটা বড্ড গরম হয়ে ছিল বলে আজ আর কোনও আঁটবাঁধ মানেনি সে। বউয়ের তোশকের তলা থেকে এক খাবলা টাকা তুলে নিয়ে সোজা চলে এল কালীর ঠেক-এ! সময়টা জলের মতো বয়ে গেল।

রাস্তাটা একটু দুলছে বলে হাঁটাটা তেমন সটান হচ্ছে না তার। ঝুলা পোলের মতো দুলবার দরকারটাই বা কী রে তোর? একটু থিতু হ' না বাপু। আজ বাড়িঘরগুলোও মোটে স্থির হয়ে নেই, বড্ড পাশ ফিরছে। তা হোক, সবাই আনন্দে থাকুক বিনোদের মতো। বুড়ো বয়স ঝেড়ে ফেলে এই যে নতুন বিনোদ বেরিয়ে এল, এটা কি টের পাচ্ছে লোকে?

আচ্ছা, সে যাচ্ছে কোথায়? সেই বুড়ি বউ আর বদ্ধ ঘরের দমচাপা বাড়িটায়? ওই রকম থেকে থেকেই তো বয়সের উইপোকা তার শরীরে বাসা বেঁধেছিল। যুবক বিনোদ ওই বুড়িটার কাছে যাবে কেন? সেটা তো নিয়ম নয় হে বাপু! এখন যেতে হলে কাঁচা বয়সের মেয়ের কাছেই যাওয়া ভাল। কিন্তু কারও কথাই মনে পড়ে না যে!

কুয়াশা চেপে ধরেছে চরাচর। সাদা ভূতের মতো চার দিক গুলিয়ে দিচ্ছে। রাস্তাঘাট বেভুল, উল্টোপাল্টা। এ রকম গোলমাল হলে বড় মুশকিল হয়। ভেজা ধুতিটা ছ্যাঁত ছ্যাঁত

করে লাগছে গায়ে। ধুতিটা ভেজা কেন তা বুঝতে পারছে না সে। বৃষ্টি পড়ছে কি? না কি জলে নেমে পড়েছিল! কিন্তু এখন সে ডাঙা জমিতেই হাঁটছে বটে! ঘড়াৎ করে একটা ঢেঁকুর তুলে সে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলে, আজ বড় আনন্দ... থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ...

হাতে টর্চ নিয়ে বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে সরস্বতী আর বিম্ববতী। মা বারণ করেছিল, যেতে হবে না। আমার তোশকের তলা থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে, আজ মদ গিলে আসবে। সরস্বতী আপত্তি তুলেছিল, বাবা তো ছেড়ে দিয়েছে মা!

—শয়তান কি আর রং বদলায়? হাবভাব আমি ভাল বুঝছিলাম না। ঠিকই ফিরবে। যাবে কোথায়? মুরোদ জানা আছে।

তবু দু'বোন কিছু ক্ষণ দেখে বেরিয়েছে। রাত দশটার পর গঙ্গারামপুরে আর কবরস্থানে তফাত নেই। তার ওপর আজ বড় দিক-ভুল কুয়াশা। হিম পড়ছে একটু একটু। রাস্তায় উঠে দু'বোনে ভয়ে ভয়ে দেখল, দোকানপাট সব বন্ধ। আলো তেমন নেই, খাঁ খাঁ করছে। কাশীনাথের পাইস হোটেলটা খোলা, কিন্তু খদ্দের নেই তেমন। বাসন ধোয়ার শব্দ হচ্ছে।

—হ্যাঁ রে দিদি, বাবা যদি মদ খেয়ে থাকে, তা হলে কী করবি? আমার যে মাতালকে খুব ভয়!

—দূর! মাতালকে ভয়, তা বলে বাবাকে তো নয়।

—যদি আমাদের চিনতে না পারে?

—মদ খেলে কি আর নিজের ছেলেমেয়েকে চিনতে পারে না নাকি?

দু'জনে খুঁজল খানিক, তবে তেমন করে খুঁজতে সাহস হল না। রাতের দিকে মাতাল-বদমাশদেরই তো জো!

—চল, বাড়ি যাই। দাদা এলে ঠিক বাবাকে খুঁজে আনবে।

সাইকেল চালিয়ে ফেরার সময়ে হঠাৎ প্রীতমের মনে হল, সীতুর দিদির মুখখানাই দেখা হয়নি তার। শেফালি না কী যেন নাম! মেয়ে নিয়ে তার কোনও চিন্তাভাবনা নেই। বিয়ের কথা ভাবে না, সংসার করার কথাও ভাবে না। তার এখন মেলা কাজ। ক্যারি করে নিয়ে এল অথচ মুখ-চেনাই হল না, এ একটা মজার ব্যাপারই হয়ে থাকল। কোথাও দেখলে চিনতেই পারবে না। কথাও কয়নি তার সঙ্গে বিশেষ।

বাড়ির সামনে এসে যখন নামল প্রীতম, তখন এগারোটা বাজে। সাইকেলখানা সযত্নে দু'হাতে তুলে গ্রিলের বারান্দায় রাখার সময় সে গন্ধটা পেল। একটা মৃদু মেয়েলি গন্ধ সাইকেলখানার গায়ে লেগে আছে।

ঠক করে দরজা খুলে সরস্বতী বেরিয়ে এল, দাদা, বাবা এখনও ফেরেনি।

—সে কী? কোথায় গেল বাবা?

—আমরা খুঁজে এলাম।

প্রীতম দাঁড়াল না। সাইকেলটা নামিয়ে পাঁইপাঁই করে চালিয়ে দিল। খালের ওপর সাঁকোটায় বেভুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিনোদ। কোন দিকে যাবে ঠিক পাচ্ছিল না। এখানে শুয়ে থাকলেও হয়। আর সেই কথাটাই নিজেকে বোঝাচ্ছিল সে। বাড়িঘর আবার কী, বউ ছেলেপুলে আবার কী, সংসার আবার কী, আকাশে ভগবান আর নীচে এই তুমি, এ বই আর কিছু নেই। ঠেসে আনন্দ করো বাবা। যৌবন ফিরে পেয়েছ, আর চাই কী? একটা ভোজ দিয়ে দিও বরং। ব্যাপারটা সাব্যস্ত হওয়ার পর বিনোদ হেঁকে সবাইকে জানান দিল, অ্যাই সবাই শুনে রাখো, কাল সবার ভোজের নেমন্তন্ন। বুঝলে! এই আমি খাওয়াব সব্বাইকে। সব্বাইকে। সব্বাইকে। কেউ যেন বাদ না যায়।

বিনোদের এই হাঁকটা শুনতে পেল প্রীতম। সাইকেলখানা গড়িয়ে কাছে এল, মদ খেয়েছ নাকি?

—কে? কে রে?

—বাড়ি চলো।

একগাল হাসল বিনোদ, ও তুই? এই সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে দিলাম, বুঝলি!

—বেশ করেছ, এ বার চলো।

আর গাঁইগুঁই করল না বিনোদ। সাইকেলখানায় হাত রেখে টাল সামলে সামলে হাঁটতে লাগল। কোথাও একটা যাচ্ছে সে। সেই বুড়ি বউ, সেই চেনা ছেলে-মেয়ে, সেই বদ্ধ ঘরের খাঁচা, সেই বুড়ো বয়স। ভাল লাগে না বিনোদের।

গভীর রাতে বারান্দায় রাখা সাইকেলখানার গা থেকে একটা মিষ্টি মেয়েলি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। সাইকেলখানার বড় ধকল গেছে আজ। রোজই যায়। আজ এত ধকলের

পরও মিষ্টি গন্ধ মেখে বড় ভাল লাগছে তার। নিথর ঘুমের মধ্যেও তাই সাইকেলটা মাঝে মাঝে ফিকফিক করে হেসে উঠছে।

[সমাপ্ত]

সৌজন্যে: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ পৌষ ১৪১৩ রবিবার ৭ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ২১ মাঘ ১৪১৩ রবিবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭